ইউনিট ১ **অধিবেশন ১**

শিক্ষার্থীর বাংলা ভাষায় পারদর্শিতা উন্নয়নঃ 'শোনা' শিক্ষণ পদ্ধতি

মানুষের ভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ভাষা। জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা কর্মপরিকল্পনা সব কিছুরই মাধ্যম ভাষা। ভাষা হচ্ছে মানুষের মুখ থেকে নির্গত অর্থবোধক ধ্বনির সমষ্টি।

ভাষাতাত্ত্বিকগণ বিভিন্নভাবে ভাষার সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন:

১। "মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোন বিশেষ জন সমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে"।

২। "মনুষ্য জাতি যে ধ্বনি বা ধ্বনি সকল দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে তার নাম ভাষা"।

শিশুর ভাষা বিকাশের প্রথম স্তরে থাকে অনুকরণ ও অনুসরণ। অবশ্য দ্বিতীয় ভাষার ক্ষেত্রে যুক্ত হয় পুনরাবৃত্তি ও অনুশীলন। এই প্রক্রিয়ার নামই ভাষা শিখন। ভাষা শিখন বা ভাষার ব্যবহারিক নৈপুণ্য অর্জনের চারটি ক্ষেত্র বিদ্যমান। এগুলো হচ্ছে –

ক) শোনা (Listening)

খ) বলা (Speaking)

গ) পড়া (Reading)

ঘ) লেখা (Writing)

ভাষার ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনে 'শোনা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশু যা শোনে তা-ই সে অনুকরণ করার চেষ্টা করে এবং ভাষা বিকাশের শুরু এখানেই।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- শোনা দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শ্রেণীকক্ষে শোনা দক্ষতা অর্জনে শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ করতে পারবেন।
- শোনার ক্ষেত্রে সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধানের উপায় নির্দেশ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : শোনা দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মানব শিশু জন্মের পর থেকে তার পরিচিত পরিবেশে বাবা-মা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের কথাবার্তা শুনে বিভিন্ন ধ্বনি ও শব্দ অনুকরণ করে ধ্বনি থেকে শব্দ, এবং ক্রমান্বয়ে শব্দ থেকে পূর্ণ বাক্য গঠন করে। তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করার প্রয়োজনে মাতৃভাষা শেখে ও দক্ষতা অর্জন করে। বস্তুত নিজেকে প্রকাশ করার প্রয়োজনে শিশু মাতৃভাষা শেখে ও দক্ষতা অর্জন করে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা ভাষা দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ও প্রকাশ ঘটায়। এ দক্ষতা অর্জনে শিশুরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। যেমন- শারীরিক সমস্যা, বধিরতা, মাতৃভাষা বলা ও শোনার সুযোগ না পাওয়া, অপুষ্টিজনিত অন্য কোন সমস্যা, প্রতিকূল পরিবেশ ইত্যাদি। অন্যদিকে শিশুরা স্বাভাবিক ও অনুকূল পরিবেশ পেলে তথা মাতৃভাষা ভালোভাবে শোনার সুযোগ পেলে, অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে শোনা দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়ে ওঠে।

আসুন বন্ধুরা, আমরা এখন নিচের প্রশ্নটির উত্তর লিখি।

মানুষের জীবনে শোনার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। কারণ-

১।

২।

৩।

৪।

৫।

পর্ব–খঃ শোনা দক্ষতা অর্জনে শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ

ভাষা দক্ষতা অর্জনের প্রথম সোপান হল শোনা। গৃহ-পরিবেশে শোনার প্রথম ক্ষেত্রটি তৈরি হয়। এ ক্ষেত্রে মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে। শোনার পর যখন তা অনুধাবন করা হয় তখন তার মানস প্রতিক্রিয়া ঘটে। এজন্য যিনি শোনাবেন বা শোনার দক্ষতা আয়ত্ত করাবেন তিনি তার বক্তব্যকে শুদ্ধ উচ্চারণে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করবেন।

শোনার আগ্রহ সৃষ্টি হলে মানসিক প্রতিক্রিয়া সচল হয়ে ওঠে। বক্তার স্বরের প্রক্ষেপণ ও দেহভঙ্গি এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এরপরও শ্রবণদক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের কিছু সমস্যা হতে পারে। শিক্ষকের আন্তরিক প্রয়াস, সঠিক পদ্ধতি অনুসরণে পাঠদান ও ক্রমাগত অনুশীলন করানোর মাধ্যমে সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণ ও শিক্ষার্থীদের শ্রবণ দক্ষতা অর্জনে দিকনির্দেশনা ও সহায়তা দান করা প্রয়োজন।

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুগণ, আসুন আমার শ্রবণ সমস্যা ও সমাধান অনুশীলন করি।

(ক) শোনার দক্ষতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হচ্ছে-

১.

২.

৩.

৪.

৫.

৬.

(খ) শোনার ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যাসমূহের সমাধানের উপায়গুলো নির্দেশ করুন।

১.

২.

৩.

৪.

৫.

৬.

(গ) শ্রবণদক্ষতা অর্জনে যে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা যায় তা হলো-

১.

২.

৩.

৪.

৫.

৬.

পর্ব–গঃ শোনার ক্ষেত্রে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধান

যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে 'শোনা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুনে বুঝতে না পারা বা ভালভাবে শুনতে না পারলে উদ্ভুত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। শ্রেণীকক্ষের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিক্ষক - শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী পারস্পরিক বোঝাপড়া নির্ভর করে শোনার উপর। শিক্ষকের নিম্নস্বর, কর্কশ স্বর, প্রক্ষেপণ, উচ্চারণত্রুটি, মুদ্রাদোষ প্রভৃতি কারণে শোনার ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করে। তাছাড়া অন্যবিধ অনেক সমস্যা রয়েছে। যে কারণে শুনে হৃদয়ঙ্গম করা দুসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা শোনার ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো নিম্ন ছকে চিহ্নিত করি।

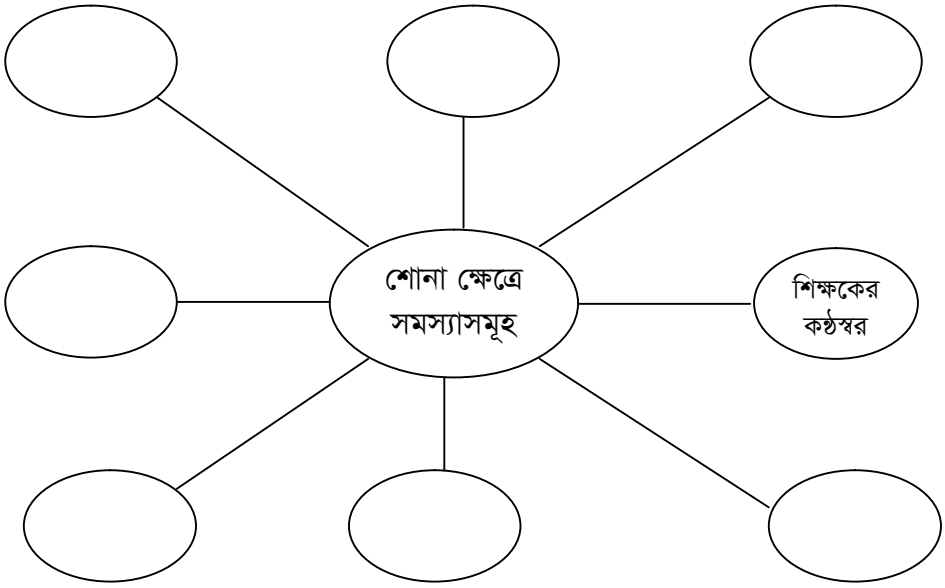

বন্ধুরা এবার আসুন - আমরা 'শোনা' সমস্যা সমাধানের উপায়গুলো খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হই।

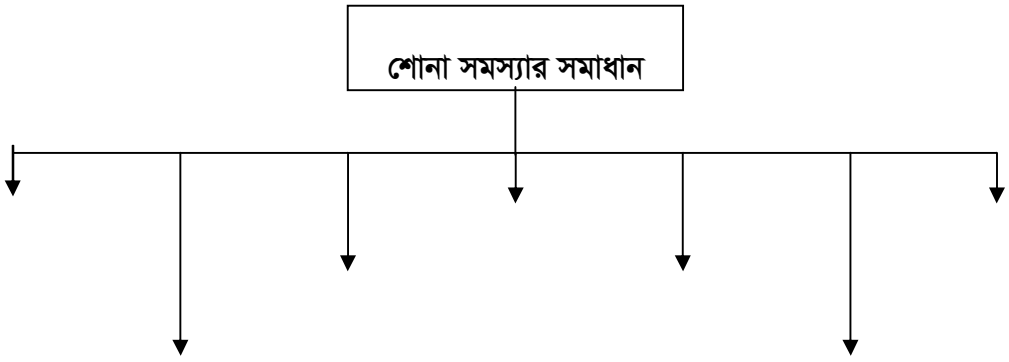

ইউনিট ১ **অধিবেশন ১**

মূল শিখনীয় বিষয়

শিক্ষার্থীর বাংলা ভাষায় পারদর্শিতা উন্নয়নঃ 'শোনা' শিক্ষণ পদ্ধতি

মাতৃভাষা বাংলায় শ্রবণদক্ষতা অর্জন করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন মনোযোগ দিয়ে শোনা। গৃহপরিবেশে শোনার সুযোগ পেলে ভাষাদক্ষতা অর্জনের ভিত্ রচিত হয়। ক্রমান্বয়ে সে ভাষা ব্যবহার করে নিজ প্রয়োজন ও চাহিদা প্রকাশ করতে পারে। শিশুরা তাদের আপন পরিবেশ থেকে যে সব আলাপচারিতা শোনে অনুকরণ করে এবং সেভাবেই নিজ ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও চাহিদার প্রকাশ ঘটায়। শিশুর যতই বয়স বাড়ে ততই সে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার ক'রে বাক্য গঠন করে এবং ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করে। তাই শিশুর ভাষাদক্ষতা বিকাশে শ্রবণদক্ষতা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ শোনার সুযোগ হলে বলার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। পরবর্তীকালে শুদ্ধভাবে লিখে তা প্রকাশ করতে পারবে। শিক্ষার্থীদের শ্রবণদক্ষতার ওপর নির্ভর করে শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলীর সাফল্য। অর্থাৎ শ্রবণদক্ষতা অর্জিত হলেই শিক্ষার্থীরা বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়ে ওঠে। ভালভাবে না শুনলে বিষয়বস্তু অনুধাবন, অনুশীলন, প্রয়োগ কোনটাই সম্ভব হয় না।

শোনা দক্ষতা অর্জিত হলে শিক্ষার্থীরা যে কাজগুলো সহজে করতে পারবে তা হলঃ

- বিভিন্ন ধ্বনি সহযোগে শব্দাবলি ও বাক্য গঠনে অভ্যস্ত ও দক্ষ হয়ে উঠবে।
- শিখন কার্যক্রমে সাফল্য অর্জন করতে পারবে।
- যে কোন বিষয় শুনে উপলব্ধি করে তা শুদ্ধভাবে প্রকাশ করতে পারবে।
- সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সে ভাষায় ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করবে।
- বক্তব্য পরিবেশনে যথার্থ স্বরপ্রক্ষেপণ ও দেহভঙ্গি প্রদর্শনে সক্ষম হবে।

শোনা শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার কৌশল, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উপায়

শোনার দক্ষতা অর্জন করতে হলে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং শোনার আগ্রহ বাড়াতে হবে। এজন্য গৃহ পরিবেশে নিকটজনের, বিশেষ করে মা-বাবার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর সঙ্গে তাদের কথা বলতে এবং কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক পরিবেশে শিক্ষক সচেতনতার সঙ্গে আকর্ষণীয় করে পাঠ উপস্থাপন করবেন যেন শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়টি

শুনতে ভাল লাগে এবং তারা তা উপলব্ধি করে অনুশীলন ও আত্মস্থ করতে পারে। সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীরা শোনার ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কিনা, তাও শিক্ষক চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হবেন। এ ক্ষেত্রে শারীরিক, মানসিক বা পরিবেশগত সমস্যা থাকতে পারে। যেমন, শিক্ষার্থী শ্রোতার শ্রবণইন্দ্রিয়ের ত্রুটি, বাগযন্ত্রের ত্রুটি, বধিরতা বা বোবা, শব্দদূষণ আক্রান্ত প্রতিকূল পরিবেশ, অমনোযোগ, অনাগ্রহ, জড়তা বা শঙ্কা প্রভৃতি। এছাড়াও শিক্ষকের উচ্চারণত্রুটি, পাঠে ত্রুটি, অপ্রিয় বিষয়বস্তু প্রভৃতি ও শ্রবণ দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে সমস্যা বা অন্তরায় হয়ে দেখা দিতে পারে। শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলিতে শোনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে শিক্ষককে অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে এসব সম্ভাব্য সমস্যা চিহ্নিত করে, শ্রবণদক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা দিতে হবে। ভালভাবে শোনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে বিষয়বস্তু আয়ত্ত করার জন্য শিক্ষক অনুশীলন কার্যক্রমের ব্যবস্থা করবেন।

মূল্যায়নঃ

১. শিক্ষার্থীদের জন্য 'শোনা' এত গুরুত্বপূর্ণ কেন- ব্যাখ্যা করুন।

২. শোনার ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের পথ নির্দেশ করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ক

১। শোনা হচ্ছে ভাষা বিকাশের পূর্বশর্ত।

২। না শুনলে বলা যায় না।

৩। ভাষার যাত্রা শুরু শোনার মাধ্যমে।

৪। জানার জন্য শোনা প্রয়োজন।

৫। নির্ভুলভাবে শুনলে নির্ভুলভাবে বলা যায়।

পর্ব-খ

(ক) শোনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হলো:-

১। মনোযোগ সহকারে শোনা

২। অনুকরণ ও অনুসরণ।

৩। শরীর ও মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

৪। বক্তার স্বর প্রক্ষেপণ ও দেহভঙ্গি।

(খ)

১। গৃহপরিবেশে পারস্পরিক আলাপচারিতা।

২। শোনার আগ্রহ উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৩। উপযুক্ত বিষয় নির্বাচন করা।

৪। বিষয়টিকে হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন।

৫। আকর্ষণীয় উপকরণ ব্যবহার।

৬। শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের বা শারীরিক কোন সমস্যা থাকলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা।

৭। অনুপ্রেরণা ও পরামর্শমূলক নির্দেশনা প্রদান।

(গ)

১। শ্রবণ-দর্শন উপকরণ ব্যবহার।

২। আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে, এ ধরনের বক্তব্য শোনানো ও বলানো।

৩। প্রেষণা সৃষ্টিকারী উদ্দীপক ব্যবহার (ভিডিও চিত্র, ভিউকার্ড প্রদর্শন)।

৪। সহপাঠীকে দিয়ে পড়ে শোনানো।

৫। শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণ ক্যাসেট বাজিয়ে শোনানো ও অনুশীলন করানো।

৬। শোনা বিষয় পুনরাবৃত্তি ও নিজের মত করে বলতে উৎসাহিত করা।

পর্ব–গ

(ক)

১। শিক্ষকের অনুপযোগী কণ্ঠস্বর।

২। শব্দ দূষণ।

৩। অমনোযোগী শিক্ষার্থী।

৪। একটানা দীর্ঘ ক্লাস।

৫। বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্ক না থাকা।

৬। বৈচিত্র্যহীন উপস্থাপন।

৭। বাজার / জনবহুল স্থানে প্রতিষ্ঠান।

৮। শ্রবণইন্দ্রিয়ের ত্রুটি।

(খ)

১। শিক্ষকের শ্রেণীউপযোগী কণ্ঠস্বর।

২। আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় উপস্থাপন।

৩। শ্রেণীকক্ষের উপযুক্ত পরিবেশ।

৪। উপকরণ ব্যবহার।

৫। উৎসাহ ব্যঞ্জকতা।

৬। ত্রুটিপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের চিকিৎসা পরামর্শ।

৭। শ্রুতিলিখন।

ইউনিট ১ **অধিবেশন ২**

শিক্ষার্থীর বাংলা ভাষায় পারদর্শিতা উন্নয়নঃ 'বলা' শিক্ষণ পদ্ধতি

ভাষা দক্ষতা বিকাশের দ্বিতীয় স্তর বলা। বলা অর্থ কথন বা কথা বলা। মানব শিশু জন্মের পরই কথা বলতে পারে না। বলার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে তার প্রায় এক বছর সময় লেগে যায়। একটি সুস্থ শিশুর দু'চারটি অসংলগ্ন শব্দ উচ্চারণে ৯/১০ মাস সময় লেগে যায়। শিক্ষাবিদগণ শিশুদের পাঁচ বছর পর্যন্ত বয়সকে কথা বলার প্রস্তুতিকাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বলার জন্য মানুষের প্রয়োজন বাগযন্ত্র। ফুসফুস থেকে শুরু করে গলনালী, জিহক্ষা, তালু, মুর্ধা, দাঁত, ঠোঁট প্রভৃতি বাগযন্ত্রের অংশ। বলা যায় –

"মাতৃভাষার অর্ন্তগত ধ্বনিগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করা, সঠিক শব্দ, শব্দগুচ্ছ ও বাক্য ব্যবহার করে মনের ভাব যথাযথভাবে প্রকাশ করাকেই বলা হয় কথন/বলা"। অর্থাৎ বলা হচ্ছে - একগুচ্ছ শ্রবণযোগ্য সংকেত।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- বলা দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বলা দক্ষতা অর্জনে সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বলা দক্ষতা অর্জনের উপায় নির্দেশ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক 'বলা' দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মায়ের কোল থেকে ভাষা শেখার প্রক্রিয়া শুরু হয়। শিশুদের কথাবলা একটি সহজাত ক্ষমতা যা সে আপনা থেকেই পেয়ে থাকে। তবে ভাষা ব্যবহারে পারদর্শিতা বা দক্ষতা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাষার দক্ষতা অর্জন ব্যতিরেকে সকল পরিবেশে ভাব বিনিময় সহজ হয় না, স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারে না, জড়তা মুক্ত হতে পারে না। আর এ সবই পরবর্তী জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

বন্ধুরা, আসুন আমরা এখন ‘বলা দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখি

বলা দক্ষতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

১	
২	
৩	
৪	
৫	

পর্ব-খ ‘বলা’ দক্ষতা অর্জনে সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ

কথা বলা একটি উন্নত মানের শিল্প। শুধুমাত্র শৈল্পিক উপস্থাপনের কারণে কারো কথা শুনতে ভাল লাগে, এর ব্যত্যয় ঘটলে তা শ্রুতিকটুতে পরিণত হয়। শোনায় ত্রুটি, বাগযন্ত্রের সমস্যাসহ অনেক সমস্যা রয়েছে যা বলার দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করে।
আসুন শিক্ষার্থীবন্ধুরা নিচে আমরা বলার ক্ষেত্রে বাঁধাসমূহের একটি তালিকা তৈরি করি।

বলার দক্ষতা অর্জনের বাঁধাসমূহ

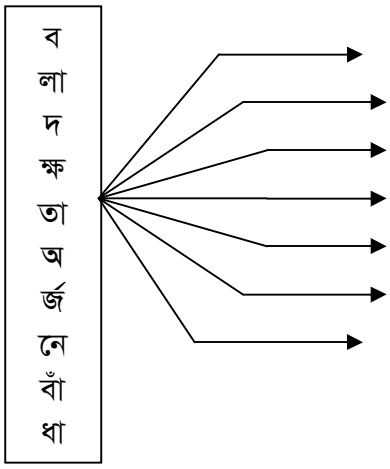

পর্ব -গ 'বলা' দক্ষতা অর্জনের উপায়সমূহ

বলা দক্ষতা অর্জন শোনার উপর নির্ভরশীল। কারণ, যারা ভাল শোনে তারা ভাল বলতে পারে। মায়ের কোল থেকেই শিশুর কথা বলা শুরু হয়। ধীরে ধীরে তার চলা ফেরার পরিধি বাড়তে থাকে, সাথে সাথে বাড়তে থাকে তার কথোপকথন, বাড়তে থাকে বলার দক্ষতা। সেই সাথে বিদ্যালয়ে শিশুরা পায় সঙ্গীদের সাহচর্য এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পরিচালনা ও অনুপ্রেরণা। ফলে বিদ্যালয়ের গণ্ডি বা তার বাইরে নানা অনুশীলনের ফলে তাদের দক্ষতা অর্জন সহজতর ও গতিশীল হয়।

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা এখন 'বলা' দক্ষতা অর্জনের উপায়সমূহ চিহ্নিত করি।

ইউনিট ১ **অধিবেশন ২**

মূল শিখনীয় বিষয়

শিক্ষার্থীর বাংলা ভাষায় পারদর্শিতা উন্নয়নঃ 'বলা' শিক্ষণ পদ্ধতি

মাতৃভাষা ব্যবহারে পারদর্শী হয়ে ওঠার জন্য কতগুলো দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। 'বলা' তার মধ্যে দ্বিতীয়। বলার ক্ষেত্রে শুদ্ধ উচ্চারণের দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। বিকাশমান শিশু তার মা-বাবা ও পরিবেশে থেকে বিভিন্ন ধ্বনি শুনে তা অনুসরণ করে এবং ক্রমাগত মৌখিক নৈপুণ্য ও পারগতা অর্জন করে। এক্ষেত্রে শুদ্ধ উচ্চারণে যদি তারা ভাষা শোনার সুযোগ পায় তবে শুদ্ধভাবে বলাটাও আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়। তাদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বলার পরিসর বাড়তে থাকে। এভাবে নিজেদের বিভিন্ন চাহিদা প্রকাশে তারা বলতে পারদর্শী হয়ে ওঠে। নিজেরা কথা বলে, অন্যের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিতে আগ্রহ বোধ করে। এভাবে বলার মাধ্যমে সে নিজের মতামত প্রকাশ করে। এই স্বত:স্ফূর্ত প্রয়াসই তাকে ভাষার মৌখিক অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করে। এই অনুশীলনের ফলে বলার ক্ষেত্রে সে ক্রমান্বয়ে দক্ষতা অর্জন করে।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় বলার দক্ষতা অত্যন্ত কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভাষা বলার দিকটি শ্রেণী পঠন-পাঠনকালে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। শিক্ষকের শব্দচয়ন, বাক্যগঠন এবং শুদ্ধ উচ্চারণ ও স্বরপ্রক্ষেপণ শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে ভাষা দক্ষতা অর্জনে প্রভাবিত করে। শিক্ষার্থী শিক্ষকের প্রকাশভঙ্গি অনুকরণ ও অনুসরণ করে।

ভাষাদক্ষতা অর্জনে সাফল্য নির্ভর করে মুক্ত পরিবেশে বাধাহীনভাবে, ক্রমাগত অনুশীলন ও ভাষা ব্যবহারে বলার চর্চার ওপর। শোনায় ত্রুটি, ভুল উচ্চারণ, মিশ্র ভাষারীতির ব্যবহার, শারীরিক ত্রুটি (যেমন- বাগ্‌যন্ত্রের ত্রুটি, জড়তা, ভয়ভীতি, অত্যধিক নিয়ন্ত্রণ ও কঠোরতা আরোপ ইত্যাদি) বলার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সমস্যাগ্রস্ত করে। এ ত্রুটিগুলো সচেতনভাবে চিহ্নিত করে, সযত্ন অনুশীলন ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চিকিৎসা সহায়তা দিয়ে ভাষা বলায় দক্ষ ও পারদর্শী করে গড়ে তোলা সহজ হয়ে ওঠে।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী তার বিভিন্ন অনুভূতি প্রকাশের কৌশল (যেমন- অনুরোধ, আদেশ-নিষেধ, ধন্যবাদজ্ঞাপন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি, প্রশ্ন করা ও উত্তর প্রদান, সাড়া প্রদান, আলোচনায় অংশগ্রহণ, অভ্যর্থনার কায়দাকানুন ও সুখ-দুঃখের ভাষা ইত্যাদি) রপ্ত করে।

মূল্যায়নঃ

১. 'বলা' দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

২. বলা দক্ষতা অর্জনের বাঁধাসমূহ চিহ্নিত করে এর প্রতিবিধান বর্ণনা করুন।

৩. বলা দক্ষতা অর্জনের উপায়সমূহ আলোচনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব– ক

১। সকল পরিবেশে ভাব বিনিময় সহজ হয়।
২। স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের ক্ষমতা বাড়ে।
৩। শিল্পিত বাচনভঙ্গি অর্জন করা যায়।
৪। নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায়।
৫। অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়।

পর্ব– খ

১। শোনার ত্রুটি
২। ভুল উচ্চারণ
৩। বাগযন্ত্রের সমস্যা
৪। জড়তা
৫। ভয়ভীতি
৬। আঞ্চলিকতা (আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার)
৭। অসচেতনতা

পর্ব– গ

১। কথোপকথন
২। আলোচনা
৩। বক্তৃতা
৪। বিতর্ক
৫। অভিনয়
৬। সৌজন্য প্রকাশ
৭। সরব পাঠ
৮। গল্প বলা
৯। ভাষণ
১০। অনুষ্ঠান পরিচালনা

ইউনিট ১ **অধিবেশন ৩**

শিক্ষার্থীর বাংলা ভাষায় পারদর্শিতা উন্নয়ন : 'পড়া' শিক্ষণ পদ্ধতি

ভাষাদক্ষতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে পঠন বা পড়া। শোনা ও বলা দক্ষতার সাথে অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে পঠনের। শিখনের শুরু থেকেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষক-শিক্ষিকার পাঠ শুনে পাঠ করে থাকে। আর পাঠের ফলে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হয়। শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা, ভাবনা-কল্পনার প্রসার ঘটে পঠনক্রিয়ার মাধ্যমে। শিক্ষা যেহেতু জীবনব্যাপি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, তাই মানব জীবনে পঠনের প্রভাব খুব বেশি। শিক্ষা গ্রহণকালে শিক্ষার্থীরা নানা পর্যায়ে, নানা বিষয়ের অসংখ্য বইপত্র পড়ে থাকে। এতে তার জ্ঞান লাভের স্পৃহা,পাঠের প্রতি মনোযোগ ও একাগ্রতা বাড়ে। পঠন একটি শিল্পও বটে। সুষ্ঠু ও সুন্দর পঠন শ্রোতার হৃদয়ে আবেগ ও মধুর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- পড়ায় দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সরব ও নীরব পাঠের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সরব ও নীরব পাঠে শিক্ষকের করণীয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : পড়ায় দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

পড়ায় দক্ষতা অর্জন মাতৃভাষা বাংলায় পারদর্শিতা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শ্রেণী পাঠনা এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় এর কোন বিকল্প নেই। পড়ার প্রাথমিক সূচনা হয় প্রধানত পূর্ববর্তী শোনা ও বলা দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে। শুদ্ধ উচ্চারণ শুনে অভ্যস্ত হয়ে শিক্ষার্থী শুদ্ধ উচ্চারণে বলতে অভ্যস্ত হয়। পড়ার দক্ষতা অর্জন বলতে বোঝায় পড়ার সময় শুদ্ধ উচ্চারণ, বিষয়বস্তুর ভাবানুসারী স্বরপ্রক্ষেপণ ও মূলভাব অনুধাবন।

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, আসুন- আমরা এখন পঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ৫টি বাক্য লেখি –

পঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা –

০১	
০২	
০৩	
০৪	
০৫	

পর্ব–খঃ সরব ও নীরব পাঠের সুবিধা ও অসুবিধা

প্রকৃতি অনুযায়ী পাঠকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- সরবপাঠ ও নীরবপাঠ। আবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠ তিন প্রকার । যেমনঃ

১. চর্বনা পাঠ (Critical Study)

২. স্বাদনা পাঠ (Appreciation Study) ও

৩. ধারণা পাঠ (Comprehensive Study)

স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে বা রবসহ পড়াকে সরব পাঠ এবং উচ্চারণ বা রব না করে পড়াকে নীরব পাঠ বলে। পাঠ সরব হোক আর নীরব হোক দু' ক্ষেত্রেই কিছু সুবিধা ও কিছু অসুবিধা রয়েছে।

আসুন আমরা এখন নিচের ঘরগুলো পূরণ করি।

সরব পাঠের সুবিধাসমূহ		সরব পাঠের অসুবিধাসমূহ	
১.		১.	
২.		২.	
৩.		৩.	
৪.		৪.	
৫.		৫.	
৬.		৬.	
৭.		৭.	
৮.		৮.	
৯.		৯.	

পর্ব–গ : সরব পাঠ ও নীরব পাঠে শিক্ষকের করণীয়

সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে সরব ও নীরব পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্ন শ্রেণীতে সরব পাঠ যেমন কণ্ঠানুশীলনের জন্য কার্যকর, তেমনি উপরের শ্রেণীতে স্বল্প সময়ে পাঠকে হৃদয়ঙ্গম করতে নীরব পাঠের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পথনির্দেশে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ করণীয় রয়েছে। বাংলাভাষার একজন দক্ষ শিক্ষক সরব পাঠ ও নীরব পাঠ সুষ্ঠুভাবে আয়ত্তকরণে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা দেবেন। তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি অধিক মনোযোগী ও আগ্রহী করে তুলবে।

আসুন, আমরা এখন সরব পাঠ ও নীরব পাঠে শিক্ষকের করণীয় সম্পর্কে ছকটি পূরণ করি।

সরব পাঠে শিক্ষকের করণীয়		নীরব পাঠে শিক্ষকের করণীয়	
০১.		০১.	
০২.		০২.	
০৩.		০৩.	
০৪.		০৪.	
০৫.		০৫.	
০৬.		০৬.	
০৭.		০৭.	

ইউনিট ১ **অধিবেশন ৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

শিক্ষার্থীর বাংলা ভাষায় পারদর্শিতা উন্নয়ন : 'পড়া' শিক্ষণ পদ্ধতি

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পড়ার শ্রেণীবিভাগগুলো হচ্ছে :

০১. বিচার বিশ্লেষণমূলক পাঠ (চর্বনা পাঠ)

০২. আনন্দ পাঠ (স্বাদনা পাঠ)

০৩. বিস্তৃত পাঠ

০৪. নিবিড় পাঠ

০৫. আদর্শ পাঠ

প্রকৃতি অনুযায়ী পাঠ দু প্রকার : সরব পাঠ ও নীরব পাঠ। সরব পাঠের সুবিধা অসুবিধা দুটোই আছে। সরব পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পঠন শক্তির বিকাশ, উচ্চারণ রীতি শিখন, বাকপটুতা অর্জন, পাঠের রসাস্বাদন ও ভাষা শিক্ষার ভিত মজবুত হয়। পাঠে সময়ক্ষেপণ হয়, কোলাহল সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার্থী সহজে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে।

নীরব পাঠে অল্প সময়ে অধিক পাঠ আত্মস্থকরণে মনোযোগ ও অনুশীলন, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা, স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি সুবিধা রয়েছে। এর অসুবিধাগুলো হল- সরব পাঠের ভিত্তি মজবুত না হলে নীরব পাঠের অভ্যাস রপ্ত করানো যায় না। অমনোযোগী শিক্ষার্থীর চোখের গতিবিধির উপর শিক্ষক সংযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হন, পড়ার ভুল ত্রুটিসমূহ শোধরানোর উপায় থাকে না। বিশেষ করে কবিতার নীরব পাঠের দ্বারা কবিতার রসাস্বাদন সম্পূর্ণ হয় না ।

পড়ার দক্ষতা অর্জনের পথে বিভিন্ন রকম অন্তরায় সৃষ্টি হতে পারে। যেমন- পড়ার অনুকূল পরিবেশের অভাব, শারীরিক সমস্যা, দৃষ্টিক্ষীণতা বা প্রতিবন্ধিতা, পঠিতব্য বিষয়ে অস্পষ্টতা, জিহবার জড়তা, মানসিক সংকোচ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব, বানান ও উচ্চারণসমস্যা প্রভৃতি। শিক্ষক সর্তকভাবে এগুলো চিহ্নিত করে সমাধানে সহায়তা দেবেন। পড়ার দক্ষতা অর্জনের জন্য কতগুলো কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতায় সহায়তা দেয়া যায়।

যেমন:

- লেখ্যরূপ ও রীতির সঙ্গে ভাষার সংযোগ স্থাপন করে অনুশীলন করানো।
- পড়ার জন্য উপযোগী বই নির্বাচন করা।
- অধিক পাঠে উৎসাহ প্রদান ও প্রেরণা সৃষ্টি করা।
- ধ্বনির লেখ্য রূপের শুদ্ধ উচ্চারণ ও স্বর প্রক্ষেপণ আয়ত্ত করা।
- বলা ও পড়ায় সমন্বিত অনুশীলন।

- শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি করে তার প্রায়োগিক নৈপুণ্য অনুধাবনে সহায়তা দিয়ে পাঠানুশীলন করানো।
- যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোর পাঠ ও উচ্চারণরীতি রপ্ত করানো।
- আবশ্যকীয় পাঠের পাশাপাশি বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক বই পাঠে উদ্দীপিত করা।

মূল্যায়নঃ

১। পঠনের শ্রেণীবিভাগ করে প্রত্যেক প্রকারের ব্যাখ্যা দিন।

২। সরব ও নীরব পাঠের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লিখুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব -ক

১। প্রতিটি মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পঠনের প্রয়োজন।

২। ইতিহাস, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয় জানতে পড়া প্রয়োজন।

৩। পঠন অভ্যাস বিনোদনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

৪। আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা, আত্মবিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠনে পঠন অত্যন্ত সহায়ক।

৫। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষার অর্থ বুঝতে পঠনের গুরুত্ব অপরিসীম।

পর্ব-খ

সরব পাঠের সুবিধা :

১। সরব পাঠে বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেওয়া সহজতর।

২। সরব পাঠ ধ্বনি প্রধান বলে পাঠক উচ্চারণের প্রতি যত্নশীল হন।

৩। সরব পাঠ কণ্ঠ নিয়ন্ত্রণের সহায়ক।

৪। স্বরভঙ্গিতে কুশলতা অর্জনের জন্যও সরব পাঠ অপরিহার্য।

৫। সরব পাঠের মাধ্যমে পাঠ্যবস্তু স্মৃতিতে ধারণ করা যায়।

৬। সরব পাঠে বিষয়বস্তুর প্রতি মন সহজে আকৃষ্ট হয় এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে মনকে নিবদ্ধ রাখা যায়।

৭। সরব পাঠে ভাষার অন্তর্নিহিত ভাবব্যঞ্জনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাঠক নিজেই তখন ভাষার ভাব ও রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

৮। সরব পাঠে শ্রবণেন্দ্রিয় অত্যন্ত সক্রিয় থাকে বলে গোলমেলে পরিবেশে পাঠ চলতে পারে।

৯। সরব পাঠে শিক্ষার্থীর জড়তা ও লাজুকতা দূর হয় এবং আত্মপ্রকাশের স্পৃহা বর্ধিত হয়। এতে তার আত্মবিশ্বাসও বাড়ে। এই আত্মবিশ্বাস শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব গঠনে বিপুল অবদান রাখে।

১০। সরব পাঠ শোনার ক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়ায়।

১১। কবিতা পাঠের ক্ষেত্রে সরব পাঠ অপরিহার্য। কবিতার ভাব, ভাষা, রস, ছন্দ প্রভৃতি সরব পাঠের মাধ্যমেই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

সরব পাঠের অসুবিধা :

১। দীর্ঘ সময় সরব পাঠে ক্লান্তি আসতে পারে।

২। সব রকম পরিবেশে সরব পাঠ সম্ভব হয় না। বিশেষ করে, হোস্টেল বা হল জীবনে সরব পাঠ বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

৩। সরব পাঠে অভ্যস্ত পাঠক অনেক ক্ষেত্রে নীরব পাঠের সময় অথবা লেখায় ঠোঁট নাড়ায়।

৪। সরব পাঠে অভ্যস্ত পাঠক সহজে কোনো পাঠ্যবিষয় নীরবে পাঠ করে পাঠের বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে পারে না।

৫। উচ্চতর শ্রেণীতে সরব পাঠ অধিক পাঠের সহায়ক নয়।

৬। সরব পাঠে গভীর অভিনিবেশ সম্ভব নয়।

৭। পাঠ ও অর্থবোধে দ্রুততা বা গতি অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

নীরব পাঠের সুবিধাঃ

১। কোন বিষয়ের গভীরে মনোযোগ দেওয়ার জন্য নীরব পাঠ উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। বিশেষ করে, গবেষক, সমালোচক, বিচারক– এদের জন্য নীরব পাঠ একান্ত প্রয়োজন।

২। নীরব পাঠ শিক্ষার্থীকে পাঠে একনিষ্ঠ ও মনোযোগী করে তোলে। সেজন্য এ পদ্ধতি অধিক পড়ুয়াদের জন্য খুবই উপযোগী।

৩। নীরব পাঠ একাকিত্ব দূর করে। অবসর সময়ের প্রিয় সঙ্গী।

৪। নীরব পাঠ পাঠককে অন্তর্মুখী করে তোলে, যা মানুষকে ভাবতে শেখায়।

৫। নীরব পাঠে সহজে শারীরিক ক্লান্তি আসে না।

৬। নীরব পাঠের চর্চা পাঠককে দ্রুত পঠনের দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে। চোখের দেখা ও বোঝা পাঠককে বিষয়বস্তুর মূল বক্তব্য অনুধাবনে সাহায্য করে।

৭। একদা পঠিত বিষয়বস্তু ভুলে গেলে তা আবার মনে করার জন্য নীরব পাঠই শ্রেয়। কারণ তখন আর পুরোটা পড়তে হয় না। বিষয়বস্তুর ওপর একবার চোখ বুলালেই চলে। এতে সময়ও বাঁচে, উদ্দেশ্যও সাধিত হয়।

৮। নীরব পাঠে শিক্ষার্থী সহজে বিষয়বস্তুর মর্ম অনুধাবন করতে পারে।

নীরব পাঠের অসুবিধাঃ

১। পঠনের দোষ ত্রুটি ধরা কঠিন হয়ে পড়ে। পাঠক নিজেও জানার সুযোগ পায় না যে তার উচ্চারণে বা স্বরভঙ্গিতে কোন দুর্বলতা আছে।

২। যে সহজে পাঠে মন বসাতে পারে না, তার জন্য নীরব পাঠ তেমন উপযোগী নয়। কারণ নীরব পাঠের সময় সামান্য অসুবিধাও তার পড়ায় ব্যাঘাত ঘটাবে। এতে একাগ্রতা সহজেই নষ্ট হবে।

৩। নীরব পাঠে 'ভাষা' শেখার জন্য মুখে বলে কানে শোনা'র যে সুবিধা তা পাওয়া যায় না।

৪। নীরব পাঠে উচ্চারণ অনুশীলনের সুযোগ থাকে না।

৫। লাজুক শিক্ষার্থী নিজের দুর্বলতা ঢেকে রাখতে পারে। এই লাজুকতা তার আত্মপ্রকাশ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধা হতে পারে।

৬। শিশু-শিক্ষার্থীর জন্য নীরব পাঠ বিজ্ঞানসম্মত নয়। বিশেষ করে, পাঠ শুরুর পর্যায়ে নীরব পাঠ বর্জনীয়। কারণ প্রথম পর্যায়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাগযন্ত্র সচল হয় এবং ইন্দ্রিয়গুলো ক্রমশ কর্মক্ষম হয়। নীরব পাঠের ক্ষেত্রে শিশু বাগযন্ত্রের কাজ থাকে না।

পর্ব–গ : সরব পাঠে শিক্ষকের ভূমিকা

১। শিক্ষার্থীরা যাতে জড়তামুক্ত হয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে পড়তে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন।

২। দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, কোলন, ড্যাস প্রভৃতি চিহ্নাদি সঠিকভাবে শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করছে কিনা তা লক্ষ করবেন।

৩। পড়ার সময় যথাযথ আবেগ রক্ষিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করবেন।

৪। কবিতা পাঠে তাল, লয়, ছন্দ, যতি, ছেদ প্রভৃতির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।

৫। পাঠের প্রতি নিবিষ্টচিত্ততা সম্পর্কে সজাগ থাকবেন।

৬। পাঠকে শিল্প পর্যায়ে উন্নীত করতে সচেষ্ট হবেন।

৭। নিজ পঠনকে মান পর্যায়ে উন্নীত করবেন।

৮। প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করবেন।

নীরব পাঠে শিক্ষকের ভূমিকা :

১। নীরব পাঠে যাতে শিক্ষার্থীরা প্রতিটি বর্ণ ও শব্দের উপর মনোযোগ দেয়, সেদিকে শিক্ষক সর্তক থাকবেন।

২। নীরব পাঠ দ্রুত হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যেন শব্দ বাদ দিয়ে না পড়ে শিক্ষক তা লক্ষ রাখবেন।

৩। সরব পাঠে ধাতস্থ হওয়ার পর নীরব পাঠ করতে দেবেন।

৪। শিক্ষক নীরব পাঠ অনুশীলনে সহযোগিতা করবেন।

ইউনিট ১ **অধিবেশন ৪**

শিক্ষার্থীর বাংলা ভাষায় পারদর্শিতা উন্নয়নঃ 'লেখা' শিক্ষণ পদ্ধতি

মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। আমরা পরস্পর ভাব বিনিময় করি ভাষার মাধ্যমে। ভাষার দু'টি রূপ–

০১. মৌখিক রূপ।

০২. লিখিত বা লৈখিক রূপ

মানুষের প্রকাশ ক্ষমতার এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার লিপির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ। মনের ভাবকে ভাষায় প্রকাশের লিখিত যে রূপ তাকেই আমরা বলি লিখন। মানুষের জ্ঞানজগতের চিন্তা-কল্পনা, ভাবনার শৈল্পিক প্রকাশের স্থায়িত্ব দিতে লেখার কোন বিকল্প নেই। মানুষের জ্ঞান যত বিস্তৃত হচ্ছে, যত সমৃদ্ধ হচ্ছে, ভাষার লিখিত রূপের মধ্য দিয়েই তা আগামী দিনের মানুষের জন্য স্থায়ী রূপে সংরক্ষিত হচ্ছে। এজন্যই ভাষার লিখন পদ্ধতি এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- লেখার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভালো লেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- লিখন দক্ষতার বিভিন্ন দিক উল্লেখ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : লেখার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

লেখা চারুশিল্প বিশেষ। মানুষ তার কথাকে লেখার মধ্য দিয়ে স্থায়ী করে রাখে। কতগুলো অর্থহীন রেখা বিন্যাসে সৃষ্টি হয় বর্ণ আর বর্ণগুলোর সমন্বয়ে গড়ে উঠে বর্ণমালা। শিক্ষাক্ষেত্রে লিখন পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। লেখা একদিকে যেমন কালিক যোগসূত্র স্থাপন করে আবার অন্যদিকে শিল্প সৌন্দর্যের প্রতিফলনও ঘটায়।

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, আসুন আমরা নিচের ফাঁকা ঘরগুলো পূরণ করি –

ক্রমিক নং	হাতের লেখার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

০১.	মানুষের মনের ভাব প্রকাশের স্থায়ী বাহন
০২.	
০৩.	
০৪.	
০৫.	
০৬.	
০৭.	

পর্ব-খ : ভালো লেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রতিটি মানুষের হাতের লেখার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অর্থাৎ ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে লিখনের পার্থক্য দেখা যায়। কেউ লেখেন খাড়া ভাবে, কেউ লেখেন বাঁকা করে। কারো লেখা স্পষ্ট, কারো অস্পষ্ট। কারো লেখা সোজা আবার কারো লেখায় লাইন উপরে উঠে যায় বা নিচে নেমে যায়।

আসুন বন্ধুরা, আমরা এখন নিচের ঘরগুলো পূরণ করে ভালো লেখার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করি।

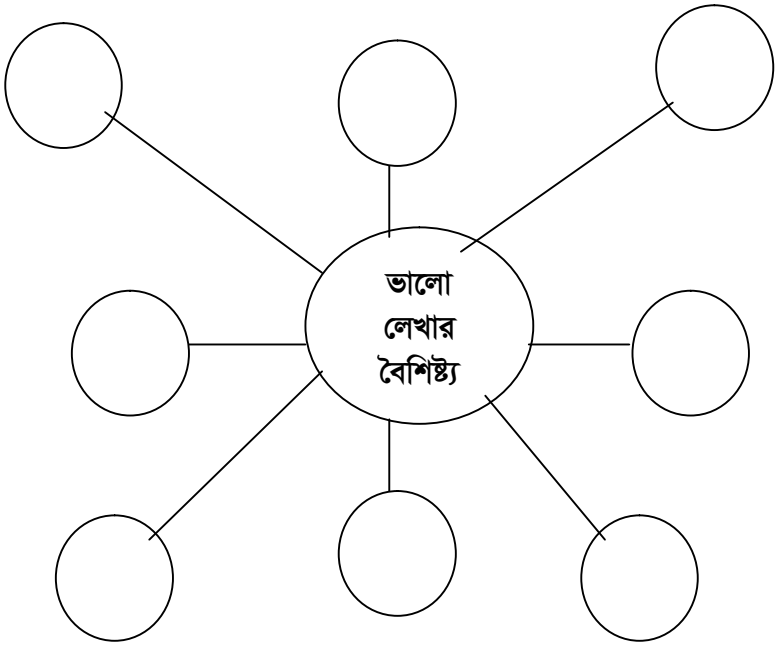

পর্ব-গ : লিখনদক্ষতা অর্জনের বিভিন্ন দিক

লেখা আয়ত্ত করা কষ্টসাধ্য অনুশীলন। শিশুরা প্রাথমিক স্তর থেকেই লেখা অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়। এজন্য তাদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করা আবশ্যক। প্রাথমিক স্তরে শিশুদের হাতের পেশী লিখন উপযোগী হয়ে যাবার পর নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে তাদের অপেক্ষাকৃত মননশীল লেখা আয়ত্ত করতে হয়। তাদের মেধা, রুচি, পারগতা অনুযায়ী অনুশীলন করিয়ে বানান, যতি চিহ্ন অধ্যায় ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে।

প্রাথমিক পর্যায় থেকে শিশুকে লেখা শিখন ও অভ্যাসের ব্যাপারে কতগুলো বিশেষ দিকের প্রতি খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

ক) শিশুর শারীরিক সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা :

প্রত্যেক মানুষের কিছু-কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্য জন্মগত ভাবেই স্থির হয়ে থাকে। ফলে কোনো শিশু সহজে লেখা শিখতে ও আয়ত্ত করতে পারে, আবার কেউ মাঝামাঝি, আবার কেউ একেবারেই হতাশাব্যঞ্জক হয়ে থাকে। পৃথিবীর বেশির ভাগ শিশুই, যদিও স্বাভাবিক ডানহাতি হয়ে থাকে কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু শুরু থেকেই বাহাতি হয়। শিশু যে হাতে লিখতে

চাইবে এবং স্বাচ্ছন্দ বোধ করবে যে ভঙ্গিতে লিখতে তাকে সেভাবেই লিখতে ও শিখতে দিতে হবে। 'বা হাতে লেখা ভাল লক্ষণ নয়' -- এমন সংস্কারে বিশ্বাস করার কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ নেই। অনেক শিশু লেখার শ্লেট বা খাতা ও লেখনীকে বাঁকা করে, এমন কি উল্টো করে ধরে। যদি এতেই সে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে তবে তাকে সেভাবেই লেখার অভ্যাস করতে দিতে হবে। শুধু চেষ্টা করতে হবে যেন সে তার সক্ষমতার সবটুকু সাবলীলতা ও আনন্দের সঙ্গে কাজে লাগাতে পারে।

বাংলা বর্ণগুলো যেসব সরল ও বাঁকা রেখার সাহায্যে গঠিত,তার একটি তালিকা প্রদর্শণ করবেন। শিক্ষার্থীদের সেগুলো অনুসরণে প্রত্যেক রেখার গতিবিন্যাস ব্যাখ্যা করে দিয়ে তাদের নিজ নিজ খাতায় তুলে নিতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা সেগুলো নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যেকটি কয়েকবার করে নিজ নিজ খাতায় অনুশীলন করবে।

পোস্টারে রেখা ভঙ্গিমা অঙ্কিত চিত্র : উদাহরণ -

-> / < ( ) --- ? -> ≅ √ * { } ~ ← | ↑ ↔ → ↓ ⊕ ∩ ∪ ∑ ⌊ ∩ ≠ ≡ [ ]

খ) বর্ণের সঠিক রূপ ও স্পষ্টতার অভ্যাস :

বাংলা বর্ণ সকলের সঠিক রূপ বজায় রাখা খুব জরুরি। বেশ কিছু বর্ণ/অক্ষর এবং যুক্তাক্ষর মিলে বাংলা লিখন পদ্ধতি খুব জটিল না হলেও কখনো-কখনো তা অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য হতে পারে। ক/ব, ন/ণ, য/ষ, ই/ঈ, উ/ঊ,হ্রস্ব/দীর্ঘ কারের চিহ্ন ু /ূ ইত্যাদির পার্থক্য এবং ক্ষ/ক্ষ, জ্ঞ/ঞ্জ এগুলোর পার্থক্য শিক্ষার্থীকে শুরু থেকেই ধরিয়ে দিতে হবে।

গ) শিখন ও লিখনের দ্রুতি :

শিখনের সঙ্গে সঙ্গে লিখনের দ্রুতি অর্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা শিক্ষার্থীর সারা জীবনের শিক্ষা এবং বিদ্যাচর্চার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। প্রথম দিকে লিখনের স্পষ্টতা এবং ক্রমে-ক্রমে লিখন-সৌকর্যের প্রতি শিক্ষার্থীর অনুশীলন পরিচালিত করতে হবে। তবে এর জন্য খুব ধীরে যেন সে না লেখে সে দিকে বেশি নজর দিতে হবে। এসবের জন্য শিক্ষক স্বল্পকালীন ও

ছোট্ট তাৎক্ষণিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে পারেন। লিখনের আড়ষ্টতা এবং ধীরগতির জন্য উত্তরকালে অনেক সময়ই কোনো-কোনো মেধাবী শিক্ষার্থীও, ভাল জানা থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষায় সব লিখে শেষ করতে পারে না।

বন্ধুরা, আমরা এখন নিচে লিখনদক্ষতা অর্জনের দিকগুলো লেখার চেষ্টা করি।

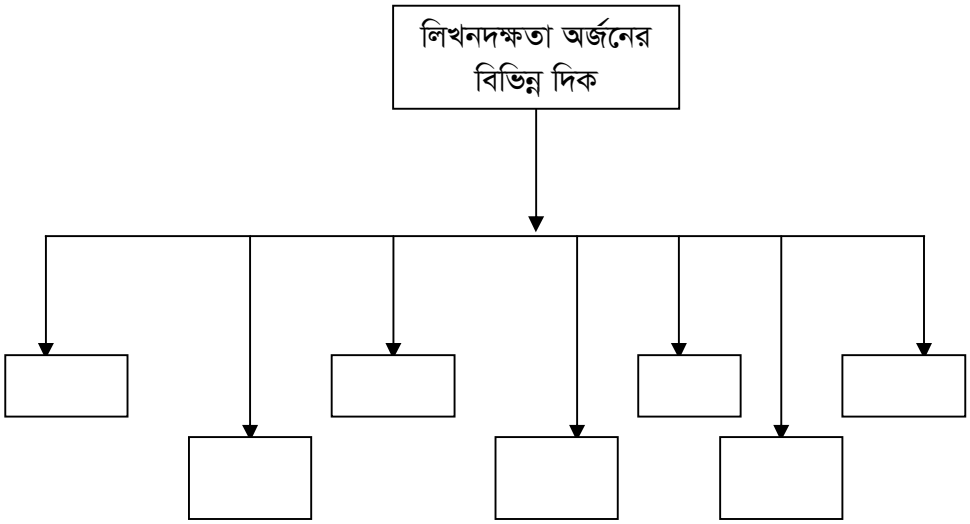

ইউনিট ১ **অধিবেশন ৪**

মূল শিখনীয় বিষয়

শিক্ষার্থীর বাংলা ভাষায় পারদর্শিতা উন্নয়ন: 'লেখা' শিক্ষণ পদ্ধতি

মাতৃভাষার পারদর্শিতা অর্জন করতে হলে লেখার কাজে দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। ভাষার কথ্য দিকটিকে স্থায়ী করে রাখার জন্য লেখার কাজটি করতে হয়। হাতের লেখা এক ধরনের শিল্পকর্ম। এটি মানুষের মনের অভিব্যক্তি প্রকাশের স্থায়ী বাহন। লেখার মাধ্যমে মানুষ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত, ইতিহাস ও তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত জ্ঞানকে সংরক্ষণ করে রাখে। এ কারণে ভাষা–পারদর্শিতা অর্জনে 'লেখা' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লেখার বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে–স্পষ্টতা, স্বাচ্ছন্দ্য, সহজ গতিছন্দ, নির্ভুলতা, দ্রুততা, স্টাইল বা ধরন ও রেখাবিন্যাস, যথার্থ অনুচ্ছেদ লেখা, সমানুপাতিক অক্ষর বিন্যাস ও সুখপাঠ্যতা। এ বৈশিষ্ট্যগুলো কোন লেখায় থাকলে সে লেখাকে মান (Standard) লেখা বলা হয়।

হাতের লেখার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, যেমন– শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, লেখার ভ্রান্ত রেখাবিন্যাস ও আকৃতি, শেখার ভুল গতি পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া, বসার ও লেখার বিজ্ঞানসম্মত বেঞ্চ ও ডেস্কের অভাব, মেরুদণ্ডের বাঁকা অবস্থানে থেকে লেখার অনুশীলন, দৃষ্টিজনিত সমস্যা, লেখার সময় আঙ্গুল ও পেশীর যথাযথ সঞ্চালনে অপারগতা ইত্যাদি। এসব সমস্যা শিক্ষার্থীদের শৈশব থেকে পরিবার ও শিক্ষকের সচেতন পরিচর্যা, নির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে তাদের স্বাভাবিক প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে হাতের লেখার কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব।

সুলিখনের বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করতে হলে কতগুলি কৌশল অবলম্বন করা যায়। যেমন– রেখা আঁকার মাধ্যমে লেখার প্রথম পাঠ শুরু করা, মুক্ত হস্তে রেখা অংকন, লেখার বেঞ্চে ও ডেস্কে মেরুদণ্ড সোজা করে বসিয়ে লেখার অনুশীলন করা, যথাযথ লিখন উপকরণের নিশ্চয়তা, মনোবিজ্ঞানসম্মত অনুশীলন ও প্রেরণা প্রদান, আঙুল ও পেশী চালনায় শিক্ষকের সযত্ন তত্ত্বাবধান, কলম ধরতে শেখানো ও সমান্তরাল রেখা বিন্যাসের চর্চা প্রভৃতি।

লেখার দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

দক্ষতা প্রযুক্ত সুন্দর হাতের লেখা মানব মনের ভাব ও ভাষার রূপময় প্রকাশ। তাই শিক্ষার্থীদের সুন্দর ও শুদ্ধ হাতের লেখার কৌশল ও পদ্ধতি শিক্ষাদানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রয়োজনীয় দিকগুলো হল–

- লেখা চর্চার মাধ্যমে ভাষার কথ্য ও লেখ্য দুটি দিক সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা সচেতনতা অর্জন করে।
- শুদ্ধভাবে লেখার দক্ষতা অর্জন করলে মনের ভাব ও ভাষা প্রয়োগের দিকটি নির্ভুল হয়।
- লেখার রেখাবিন্যাস শুদ্ধভাবে আয়ত্ত করতে পারলে, শুদ্ধ বাক্য গঠনও আয়ত্তে আসে।
- স্পষ্ট ও সুন্দর হাতের লেখা শিক্ষার্থীদের সুলিখনে অনুপ্রাণিত করে।

- উন্নত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত লেখা মানুষের শিখনমান উন্নতি করে, ফলে জীবনমানও উন্নত হয়।
- সৌন্দর্যমণ্ডিত লেখা মানুষের চোখ ও মনকে তৃপ্ত করে।

হাতের লেখায় দক্ষতা অর্জনের কর্মভিত্তিক কৌশল

১। শুরু থেকেই রেখা বিন্যাসে সমানুপাত রক্ষা করে হাতের আঙুল ও পেশী সঞ্চালনের চর্চা করানো।

২। মনোযোগ ও একাগ্রতা সহকারে লেখার চর্চা করা।

৩। আলো-বাতাস ও পূর্ণ মুক্ত পরিবেশে লেখার চর্চা করা।

৪। টানা লেখার ঝোঁক বৃদ্ধি করা।

৫। প্রতিদিন রোজনামচা, চিঠি, অনুচ্ছেদ, প্রতিবেদন, বিবরণ বা কিছু পড়ে তার অংশবিশেষ লেখা, কিছু পর্যবেক্ষণ করে তা লেখা, প্রভৃতি লেখার কাজের অনুশীলন করা।

৬। লেখা ভিত্তিক অনুশীলন কাজ মূল্যায়ন করে ত্রুটি সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

ভাষার লিখিত রূপের সঙ্গে হাতের লেখার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। ভাষার লিখিত রূপ গড়ে ওঠে কতগুলো অর্থহীন রেখা বিন্যাসের দ্বারা সৃষ্ট বর্ণের মাধ্যমে। তাই রেখা বিন্যাসের কৌশল ও দক্ষতার উপরই নির্ভর করে লেখার সৌন্দর্য। একারণেই বলা হয়ে থাকে, লেখা একটি শিল্পকর্ম। হাতের লেখায় মানুষের মনের ভাষা ও ভাব প্রকাশিত হয় এবং শিল্প ও সৌন্দর্য প্রতিফলিত হয়।

সুলিখনের বৈশিষ্ট্যঃ

- স্পষ্টতা
- দ্রুত, সহজ, স্বচ্ছন্দ ও গতিময়তা
- নির্ভুল
- সৌন্দর্য মণ্ডিত রেখাবিন্যাস
- লেখার বিশেষ স্টাইল(টাইপ বা টানা)
- যথার্থ অনুচ্ছেদ রচনা
- সমানুপাতিক অক্ষর বিন্যাস
- সুখপাঠ্যতা

মূল্যায়নঃ

১. লেখা কখন চারুশিল্পে উন্নীত হয় ? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দিন।

২. ভাল লেখার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন এবং তা অর্জনের উপায় বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব–ক

১। মানুষের মনের ভাব প্রকাশের স্থায়ী বাহন।
২। লিখন কালিক যোগসূত্র স্থাপন করে।
৩। লিখন ভাষাকে স্থায়িত্ব দান করে।
৪। সাহিত্য সৃষ্টির মুখ্য বাহন হচ্ছে লিখন।
৫। শিক্ষার্থীরা নির্ভুলভাবে ভাষা প্রয়োগ করতে শেখে।
৬। স্পষ্ট ও সুন্দর লেখা লিখনে উদ্বুদ্ধ করে।
৭। মানুষের মন ও চোখকে আনন্দ দান করে।
৮। লেখার মাধ্যমে মাংসপেশীর সঞ্চালন বেশি হয়।

পর্ব–খ

১। স্পষ্টতা
২। নির্ভুলতা
৩। দ্রুততা
৪। সৌন্দর্য
৫। স্টাইল
৬। সুখপাঠ্যতা
৭। সমান আকৃতির অক্ষর
৮। সঠিক অক্ষর গঠন

পর্ব-গ

১। বানান
২। যতিচিহ্ন
৩। অধ্যায়
৪। অনুচ্ছেদ
৫। শিরোনাম
৬। উক্তি
৭। দ্রুততা